গল্প/গদ্য

শবরী রায়

গদ্যকে

স্পষ্ট হতে হবে। কতখানি স্পষ্ট? চোখের দিকে তাকালে যতটা বেদনার আভাস ঠিক ততটা? সেটা মাপবে কে? আসলেই স্পষ্ট বলে কিছু হয় না। আড়াল বলে একটা ভূত আছে। যার ছায়া পড়েনা। কিন্তু অবধারিত সেই ভূত আছে।
কোন ভূত? কাল? অশরীর? তবে স্পষ্ট হবে কেমন করে? চাইলেও বোঝাতে পারবে না। ছিলো, ছিলো সত্যি। নেই, নেই এখন তাও মিথ্যে নয়।
সাদা পৃষ্ঠাকে আমার ঈশ্বর বলে মনে হয়
আমি ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসি
ভেতরের নীল কালি লাল কালি কালো কালি বেরিয়ে আসে আমি তাদের দেখি
সাদা পৃষ্ঠার ঈশ্বর কিছুই বলেন না।
তাঁর সবই জানা। সব...
আমি তবু আমার বিষ, রক্ত আর ঘৃণার কালি তাঁর দিকে ছিটিয়ে দিই...
আমার শেষ ঋতুর দিন এগিয়ে আসছে

এক একটা বাড়ির মধ্যে এক একটা সমুদ্র ঢুকে থাকে। নাড়াচাড়া পড়লেই টের পাওয়া যায়। লণ্ডভণ্ড ঝড় একেবারে। নোনাজলে হাবুডুবু। সাঁতার জানিনা আমি বললে হবে? কতবার ডুবলাম আর কতবার ভুশ করে ভেসে উঠলাম। একজন বললেন এই থেকেই লেখা হবে। কতবার, কতবার?? লেখা না হলেও কোমর ব্যথা,পা ব্যথা, গোড়ালি ব্যথা হবেই। রাত পোহালে ব্যথা চলে যাবে আবার পরের বিকেলে ব্যথা হবে। আমি ব্যথার সঙ্গে ব্যথার তুলনা করি। আর হাসি। ভিক্স আছে, নানারকম জেল আছে। দুহাত বাড়িয়ে সূচ ফুটিয়ে নিই। অন্য ব্যথার কথা ভাবি। তারপর আর কিছুই অনুভব করিনা।

একটা কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আজ থাক। আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। গত একুশে কোথাও একটা কবিতা পড়েছিলাম। একটা স্মারক দেখছি। বাক্স থেকে বেরিয়ে এল। কিছুতেই মনে করতে পারছিনা কোথা থেকে পেয়েছিলাম। আজ সারাদিন একবিন্দু পড়িনি, লিখিনি। বেশির ভাগ সময় অন্য ভাষায় কথা বলতে হল। বিকেলের দিকে আবিষ্কার করলাম ওই আটজন লোকের মধ্যে একজন বাঙালি। কথা কম বলেন। হাতে চাপ লেগেছিল কোনোভাবে। মুখ দিয়ে বাংলা ভাষায় ব্যথার প্রকাশ হল। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি জানেন না। আমিও তেমন জানিনা। শুধু সমস্ত ব্যথা আমি বাংলাতেই অনুভব করি এটা বুঝি।

বাংলা আমার ব্যথার ভাষা, আনন্দের ভাষা। আমার ভালোবাসা।

প্রতি লেখার অসংখ্য ভাঁজ। সব ভাঁজ সবাই খুলতে পারেনা। সময় থাকেনা। ইচ্ছেও না। এমনকি জানার বাইরেও থাকে কিছু। এই যেমন এই গাঢ় শীতের দিনে সন্ধেবেলায় স্নানে যাওয়ার রুটিন একটা অদ্ভুত ভাঁজ। নিজে নিজে খুলে ফেলেছি সেই লেয়ার। ফর্‌ল্যাঙ্গিপানি যে আসলে আমাদের কাঠটগর। কিশোরকালের গাছতলায় একটা না একটা তাজা ঝরে পড়েই থাকে। আর আমি কুড়িয়ে এনে পড়ার টেবিলে রাখি। যা বলছিলাম, সান্ধ্য স্নানের আগে হাঁটতে যাই। যাতে ফিরে এসে সোজা স্নানঘর। আজকাল কোনো ঘরেই

দেয়াল দরজা নেই। কারণ কেউ কাউকে চেনে না। না চিনলে কি আর লজ্জার বোধ থাকে। মান অপমানের, ঘৃণার। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যা কানে এল তার বাংলা অর্থ হল একদমই সময় হচ্ছে না তাই না? সঙ্গে হাসি থাকলেও মুখ ম্লান, চোখের কোণায় দেখলাম কিঞ্চিৎ পৃথুলা, গতিও বেশ কম। ফোন কানে হেঁটে বেড়াচ্ছে অজস্র মানুষ। কত কথা বলার লোক সবার। ভেতর ভর্তি মানুষ নিয়ে একলা মানুষ হাঁটছে। আজকাল দিনে বেশ কয়েক ঘন্টা আমি ফোন থেকে দূরে থাকি। মহিলাকে পেরিয়ে গেলাম। কিন্তু গলার স্বরটা কানে আটকে রইলো। আর আটকে রইলো বলেই হয়তো আরো বেশ কয়েকজন কে দেখলাম কানে ফোন। গতি ধীর। যেন বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। কথা শেষ করেই ঘরে ঢুকতে হবে। ছোট, বড়, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় এমন অনেক দিকেই নজর গেল। আমার হাঁটার গতি দ্রুততর। ফেরার পথে ফলের দোকান। পাকা পেঁপে তেতো দিয়েছিল। আমিই সুন্দর দেখে বেছে নিয়েছিলাম। কাটার পরে সুন্দর পপিতা বিষ তেতো। দোকানদারকে মৃদু হেসেই বললাম, ওই বা বেচারা কি করবে। অন্য ফল নিয়ে প্রায় দৌড়ে যখন ফিরছি, আবার সেই মহিলার সঙ্গে দেখা হল। তার গতি আরো ঢিমেতেতালা। মুখ অন্ধকার। আবছা আলোয় কি জলের রেখা দেখলাম। যাকগে আমরা কেউ কাউকে চিনিনা। স্নানস্পৃহা বেড়ে গেছে ততক্ষণে। বাইরে থেকে কাঠটগর কুড়িয়ে এনেছি। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিসর্জন দিচ্ছিলাম আমার গরম পোশাকের লেয়ার। মানে ওই ভাঁজ আর কি। গত সন্ধেয় আমার স্নানের গলিত সাবানের নাম ছিল ফর্‍্যাঞ্জিপানি অয়েল...

শরীর ব্যথা পেলে, কাঁটা ছেঁড়া বেদনা সারতে একুশদিন লাগে, তারপর যা পড়ে থাকে সেসব দুঃস্বপ্নের গন্ধ। গরম তেলে শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে,রসুন ফোড়নেও যেতে চায়না। এইসব মেয়েলি টোটকার সঙ্গে যোগ করেছি আতরমাখানো তারবাজনা, রঙ ভরা ভেজা প্যালেট আর ধূসর ক্যানভাস। এখনো সেরে উঠিনি। যমুনা পেরোলেও বুঝতে পারিনা। দেখিনা প্রেমজল, শুনতে পাইনা বাঁশি। সেতু আমায় সুদৃশ্য টানেল দেখায়। আকাশের গা জুড়ে বিনবিনে ঘায়ের মত উড়ছে অজস্র কালোচিল। আমি ভরদুপুরে ওদের লোভের উৎস খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি আবর্জনার পাহাড়। ওই পাহাড় থাকে, পাশে গড়ে ওঠে জ্বালানির কারখানা আর নরমসরম ফুলবাগান।

দেহের ব্যথার একুশদিন পর আরো তিনবার একুশদিন চলে গেলে কথারা লঘু হয়, কুয়াশায় রোদ্দুর মিশতে থাকে। চিঠি থেকে উড়ে যেতে চায় শব্দের চড়ুই, জঙ্গলাছাপ পাহাড় থেকে নির্মূল হতে থাকে কোমর সমান ঘাসেরা, সাপেরা খোলস বদলে নতুন।

এই তো এখন সপ্তাহে একদিন, এরপর দুসপ্তাহে একদিন, তারপর মাসে, দুমাসে, ছমাসে....মিলিয়ে যাবার আগে কিম্বা কী জানি...

হুশ.... উড়ে গেল পাখিটা। কোনো কাজ নেই। গভীর জলে সাঁতরাচ্ছে চুনোপুঁটি। না কোনো কামকাজ নেই। মাথাই নেই। কী হয় মাথা থেকে? আর কোনো বিষয়ে মাথার ঘাম কপাল বেয়ে গড়াতে দেবো না।

আমার বাথরুম এর জানলায় কাঠবেরালি বাসা করেছে। খড় পেলো কোথায়? রঙিন পালক? একটা গোলাপি মোজা এনে রেখেছে ওই বাড়ির ছাদে। ধীরেধীরে দেখছি বাড়িটা গভীর হচ্ছে। ওই বাড়ি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ল্যাজমোটা কাঠবেরালি, না ভেবেচিন্তে আমাকে কী যে ফ্যাসাদে ফেললো...

পাহাড়ে জঙ্গলে এখন বসন্ত। এমন বসন্ত যে ধূসর আবীরে ঢেকে আছে গাছপালা। বেশিরভাগ গাছ নিষ্পত্র, খটখট করে হাসছে, আভরণহীন। একটা আগুনের টুকরো ছুঁড়লে যে কোনো মুহূর্তে লেগে যেতে পারে দাবানল।নদীর যেখানে সেখানে মাথা তুলেছে বড় বড় পাথর। রাস্তা হঠাৎ করে বেশ ভালো হয়ে গেছে। ভালো রাস্তা মানেই গতি। ভরপুর আলোয় নদীর গভীরে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাস। এসব দেখতে হল।

আজকের মত ড্রাইভার এ জীবনে দেখিনি। রীতিমত কবি। সেবক পেরিয়ে আবিষ্কার করলো গাড়িতে তেল ভরতে ভুলে গেছে। ছোট ছোট চায়ের দোকান থেকে এক দু লিটার তেল ভরছে আর একটু এগোচ্ছে। এভাবে বেশ অনেকটা পথ পেরিয়ে পাওয়া গেল পেট্রল পাম্প।

একটা বাড়ির ছবি আছে। চেনা চেনা মনে হচ্ছে? ওখানেও খানিকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল। অনুসন্ধান। মনে পড়েছে সিনেমাটার কথা ?

এখন পাহাড়ে দুশো মিটার অন্তর ক্ষমতার মুখ, কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে হাসি, নেপালি শিশু কোলে পোস্টার। এসব নিয়ে আমাদের মত আদার ব্যাপারীদের না ভাবলেও চলতে পারে। চোখ যত কম দেখে ততই ভালো। রাস্তাঘাট ভালো হয়েছে যে, সেবক ব্রীজ এর ক্যাটকেটে রঙ বদলে প্রাইমার পড়েছে।

নেপালী কবি ড্রাইভারের কথা আমি একদম শুনিনি। কাল থেকে অকারণ বিপদের পর বিপদ, তারপর বিপদ। আজ নির্বিঘ্নে ঘুমোতে চাই। শেষের ছবিগুলো সিংটামের।

পাহাড়ে ধূসর বসন্তে নদী আশ্চর্য নির্লিপ্ত। সবুজ, স্থির, আত্মমগ্ন। তিস্তাকে দেখে রংবদল শিখতে হয় সত্যি। ভালোবাসা যার পেছনে ঘুরে ঘুরে আসে,এ নিয়ে যার বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই....

লুকোচুরি খেলা কে যে আবিষ্কার করেছিল। সেই ছোটবেলা থেকেই আমরা লুকোচুরি খেলা শিখে যাই। এই খেলা কেউ ভোলে না কখনো। খুব সামান্য মজার এই খেলা আমাদের ধীরে ধীরে সম্ভ্রম, আভিজাত্য, সংযম,ধৈর্য, সর্বোপরি গোপন শেখায়। আমরা সবাই লুকোচুরি খেলি। আমাদের মায়েরা খেলে, ভাই বন্ধু সবাই খেলে। চোখে স্বচ্ছ রুমাল বেঁধে খেলি আমরা, দেখেও দেখতে পাইনা, জেনেও জানিনা, বুঝেও না বোঝার ভান। কখনো ধরা পড়েও পড়িনা। কখনো ধরতে পারলেও অধরা রেখে দিই। খেলা আর কে ভাঙতে চায়। শৈশব আর কে ফুরিয়ে ফেলতে চায়.. মাঠ ময়দান ক্রমশ বড় হতে থাকে.. লুকোচুরির গণ্ডিও...

আমাদের পিঠে অতীতের ব্যাগ প্যাক। রক্ত বীর্যের দাগ লাগা তোষক, লালশালুর লেপ, শিমুলতুলোর বীজ সহ বালিশ। আমাদের পিঠে এসবই কুঁজের মত সেঁটে আছে, অতীতের মাংসপিণ্ড হাড়গোড় মজ্জা। আমাদের দেহের অতিরিক্ত অংশ। এই ভার আমাদের বসন্ত, এই ভার আমাদের পৌষ পার্বণ, এই তো আমাদের মল্লার, এসবই উৎসব। এসব নিয়েই আমাদের নিজস্ব শ্মশানযাত্রা। পথে যতটুকু দেখা হয়, বন্ধুর মুখ, বাঁশি, পান্থশালা, উড়ে যাওয়া ছাই মেঘের দিক পরিবর্তন... ঠিক ততটুকুই আমাদের বিরহ, আমাদের মাথুর, আমাদের ভাবসম্মিলন...

বাঘের চওড়া জিভ চাটে খাঁড়িজল। যৌনতার গন্ধ ভাসে এই ছবিতে। ছবিটা রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে নিজের কব্জির দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার চোখ আমার নিজের হাড় ভেদ করে মজ্জা চাখে। আঁশটে নুন বদলে ফিকে হয়ে যেতে থাকে, মিশে যেতে থাকে হাটের ধুলোয়, বাতিল করে দেওয়া পুরনো কার্পেটে। নিজের সঙ্গে নিজের প্রতিযোগিতায় একটু একটু করে কম সুর লাগে রোজ। মরা লাল শতরঞ্জির ওপর বার্ধক্যজনিত রোগে প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া কুকুরটার সঙ্গে মিল পাই নিজের। যার ক্ষুধা প্রায় মিলিয়ে গেছে, ঝরা লোমে শীতকাল হাসছে খিকখিক। অথচ উৎসবের মধ্যেই যাকে নিলডাউন হয়ে থাকতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে দরদাম, কেনাবেচা, জিতে যাওয়া আর ঠকিয়ে দেওয়ার বিপরীত উল্লাস। নকল নীল পাথরের নকশা নিঃশব্দে গলে গিয়ে মিশে যাচ্ছে দূষিত পতিত পাবণীতে। আকাশ রঙ বদলাচ্ছে খুব ধীরে। শেষ হয়ে আসা রাতের বেহালায় ছড় টানে আমারই চোখের শক্ত পালক। তুমি শুনতে পাওনা। তোমার চোখ নেই। তোমার কান ওই শার্দূলের কানের সঙ্গে বদলে গিয়েছে। যে নুন চাটছে খাঁড়ির জলে পিছলে পড়া যোনির। আমি আমার ডান হাতের কবজি থেকে চোখ সরিয়ে নিলে হাড় মজ্জা মাংস স্বস্থানে ফিরে যায়। রোদ্দুরে টাঙানো ছবি শুকনো হয়ে আসে। আমি আমার জল ধরে রাখি।

যে জলের ফোঁটা জমে মুক্তো হয় বন্ধ ঝিনুকপাতায়...

অতদূরের বিস্ফোরণ আমি আর দেখতে পাইনা। কোনো আঁচ গায়ে লাগেনা, ছাই ও উড়ে এসে পৌঁছয়না আমার কাছে। এই কাছের পিঁপড়েদেরও চোখে পড়েনা।দেখতে পাইনা ভনভনে মাছি, গুনগুন মশাদের প্রজাপতিমার্কা ওড়া। আমার একটা চোখের অসুখ হয়েছে। বুক থেকে খয়েরি রঙের জল এসে চোখের বারান্দায় চিক টাঙিয়ে রেখেছে। সেই থেকে রোদ্দুরও ওঠে না। মেঘও করেনা। তবে মেঘলা মেঘলা ভাব টের পাই। আমার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ময়ূর। আমি তাদের নীলচে সবুজ পাখার গন্ধ পাই। তাদের তীক্ষ্ণ চোখে আমার প্রতি যত্ন টের পাই। আমার গায়েও অজস্র পালক। দেখতে না পেলেও পালকের সাদা সুগন্ধ আমাকে ভরিয়ে রাখে। মরানক্ষত্র থেকে রওনা দিয়েছে সময়ের সীমাবিহীন ভালোবাসার চিঠি। দরজাবিহীন এই কাচের ঘরে ময়ূরের পাহারায় সাদা পালকবিশিষ্ট আমি চোখের মাথা খেয়েও বেশ ভালো আছি এখন।

মস্তিষ্কে মৌচাক। খোপে খোপে ভরা মধু। জমা হয়। গড়িয়ে যায়। জমা হয় মোম। কত মৌমাছি। সারাদিন শ্রমিক তারা।উপোষী শ্রমিক।মধু নির্মাণ এক জটিল প্রক্রিয়া। ষড়ভুজে স্বেদ জমা রাখে সম্পর্কের মৌমাছি। শীতের চলে যাওয়া দেখে কমলালেবুর খোসা। তলপেটের চামড়ায় সমুদ্র সরে যাওয়া দাগ। দম বন্ধ করে রাখা বসন্তের ধুলো-আবির অপেক্ষায় আছে। মৌচাক রোজ বড় হয়। মৌমাছি বাড়ে। ঋতু যায় আসে।

কলারে গভীর দাগ। তিনজন্মের পরত পড়েছে। মুছতে মুছতে দেখি জন্ম বদলে যাচ্ছে। শিরিশকাগজের ঘষায় এমনকি বদলে যাচ্ছে মুখ। সব মুখই এক। ওই একই নাক, চোখ, অভ্যেস, নেশা। অজস্র শালিক পাখি যেন। হলুদ ঠোঁটের কোনো বসন্তকেই চিনতে পারিনা আর। ওরা ডানা ঝাপটায় আর উড়ে যায়। কেউ কারুর চেনা নয়। কোথাও কোনো সম্পর্কের বাঁধন নেই। এই নিকটে, ওই দূরে, এই তিন পা লাফায় তো ওই চার পাক উড়ে ডানা মুড়ে বসে যায় খুদকুঁড়োর পাশে। মানুষ শালিক। কলারে খয়েরী দাগ। ঠোঁটে বসন্ত। চোখে গভীর সুলেখা কালি।

সকাল এবং সন্ধের রঙ একই। কেবল দিক পালটে যায়। পাশ ফিরে শোওয়ার মত।

জোঁকের চোষকে ঠোঁট রেখেছি। আমাকে চুষেছে জোঁক। আমিও তাকে। আমার কালো রক্ত তার চামড়ার নীচে টলটল করে। কষ বেয়ে গড়িয়ে যায় খুন।

এতো বলারই বা কি আছে। জল দিয়ে ঘুম ধুয়ে ফেলি চোখ থেকে, আর গতি দিয়ে মুছে দিই আয়নার পেছনের পারদ। এতো দেখারই বা কি আছে।

ডাঁটি ভাঙা ফুলদের প্রত্যাখ্যান করেছি বারবার, ফুলপাত্র আর জল নিয়ে নাড়াঘাঁটা আর ভালো লাগেনা বলে। জল বড় স্পর্শকাতর আর ফুলপাত্র বিচিত্র ধরণের গম্ভীর, সাজসজ্জা খুলে ফেলতে জানেনা। স্পর্শকাতরতা ছায়ানৃত্যে ভয় দেখায়, আমি ভয়কে দেখি। সাজসজ্জা তো আসলে উলঙ্গপনা ঢেকে রাখা। দেখানোর মত নগ্নতা থাকলে দেখানোই ভালো। এই বেদনায় চোখ ঝলসে যায়, মোমবাতি শরীরের সামনে মাথা এমনিতেই নীচু হয়ে থাকে গভীর প্রার্থনায়। মোমবাতির কি আর সাজ হয়? ডাঁটি ভাঙা ফুলকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই ফুলেল সময় আমাকে ত্যাগ করেছে। প্রত্যাখ্যান এক অপরূপ শব্দ। এর মধ্যে রূপকথা লুকিয়ে থাকে। তোমার আমার সবার এইসব রূপকথা বেডসাইড টেবিলের কিতাব। যার যার ভাষা নিজের। অন্যের অজানা হলে কি হয়। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা গ্রন্থ। কি দারুণ মজার ব্যাপার তাই না? নিজের রচনা না ঘুমনো রাতে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থাকে নিজেরই অন্য দিকে। যেদিকে আলো পড়েনা। যেদিকে তাৎক্ষণিক অমাবস্যা।

আমি আমার অস্ত্র ব্যবহার করি না। পরিচর্যা করে তুলে রাখি নীল ভেলভেটের বাক্সে। প্রতিটা অস্ত্রের মাঝে রেখে দিই রক্তকস্তুরি গন্ধ মাখানো রুমাল।
সম্পর্কে গাঁঠ আছে, এলেবেলে সম্পর্কের লাল উলের বলে, বেড়ালের খেলাধুলার জট আছে। ধৈর্য আর কাঁচিকে আমি পাশাপাশি রাখি। ওদের পরস্পরের প্রতিযোগিতা দেখি, দেখি সহনশীলতাও। না, অস্ত্র ব্যবহার করিনা। অস্ত্র ব্যবহারের জিনিস নয়। ধার কেবলমাত্র সংরক্ষণের জন্য। ওই গন্ধমাখা রুমালই যথেষ্ট। প্রয়োজনে রুমালে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট, যথেষ্ট।

আমার সমস্ত গোপন, কবরের মাটি মাটি গন্ধ পায়। নরম আর কঠিন পোকাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সময় দিতে হয় তাকে। হাত এবং পায়ের মৃত্যু ঘটেছে। ক্রমাগত ঠাণ্ডা হচ্ছে তারা। এরপর ধীরে ধীরে সহজ মরণ সংকোচ। পা আর হাত কিই বা জানে! ওরা ছিল একদিন নির্দেশবাহী শ্রমিক। এখন ঠাণ্ডা এবং নীরব মধ্য দুপুরের সাধনায়। গোপনের গল্পগুলোর সঙ্গে ওরা রাস্তায় হেঁটেছে, রোগা হাত রুটি আর শাক খেয়েছে কোণা ভেঙে, নড়বড়ে দুর্বল পা গোড়ালির ফোস্কার সঙ্গে চোরপুলিশ খেলেছে। চোট্টামি করতেও বাধেনি।

গোপন সব জানে। বিষ এবং চলাচল। ঘূর্ণি এবং স্রোতের। এইসব লেখা কারো উদ্দেশ্যে নয়। যে ঘুরে ফিরে বারবার ভালোবাসি বলে যায়, মনে করিয়ে দিয়ে যায় মাটি দিয়ে লেপে রাখা আমার নিত্যকার উনুনের কাজও সে মন দিয়ে দেখে রোজ, আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকে একটা সাধারণ বাঁশি তৈরির অপেক্ষায়... এইসব লেখা সেইরকম কারোর উদ্দেশ্যেও নয় যার দীর্ঘ রেলগাড়ির কম্পার্টমেন্টগুলো ভরা ভর্তি খুচরো পয়সার মানবসম্পদ নিয়ে অন্য গোলার্ধের দূষণহীন অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এইসব লেখা আমার গোপনের সঙ্গে একান্ত আমার। যে মৃত হাত পা ছাড়া প্রয়োজনীয় সব অঙ্গ দান করে দিয়ে গেছে। আর আগুনের জন্য রেখে গেছে একটা সূর্যমুখী ফুলের রাখি....

বাড়িতে অতিথি এলে কী ভালোই না লাগতো ছোটবেলায়। তারা যে সবাই আত্মীয় হত এমন নয়। মা-বাবার বন্ধু সহকর্মী, অনাত্মীয় কাকু, পিসি,মামা,মাসী,দিদি,দাদা, ভাই বোন এমনকি হসপিটালে বড় হতে থাকা কুড়ানিও আমাদের বাড়িতে এসে থাকতো মাঝেমাঝে। কুড়ানি অন্যপ্রসঙ্গ। আজ আমি শুধু অতিথির কথা ভাবছি। ভাবছি তখনকি এখনকার মত এত বাড়িঘর দুয়ার গোছান হত? আমরা যেমন আটপৌরে তেমনি কী থাকতাম না? শুধু আনন্দটা চতুর্গুণ। মা সময় না পেলে, বেণুপিসি হাঁসের ডিমের ডালনা রাঁধতো। লেবুপাতা সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতো স্যালাড। আয়োজন কম, ভালোবাসা চতুর্গুণ। ভালোবাসা থাকলে বাইরের সাজ না হলেও চলে।

আজ সকালে মাকে ফোন করেছিলাম, কী করছো মা?---'কাজ করছি।'----'সবসময় কিছুনা কিছু কাজ তো করছোই।' ---'মালতী ওই কাপড়টা ভিজিয়ে দে তো..., আমি একভাবে থাকি, আজ সব জানলা গুলো খুলে দিলাম।.. '

বোঝা গেল ওই ভেজা কাপড়ে মোছামুছি চলছে। কী ঝর ঝর হাসি। আমি বাতাবীলেবুফুলের গন্ধ পেলাম। যে কেউ এলেই এমন আনন্দ? যে কেউ এলেই! কী করবো বুঝে পাইনা। আমার আয়োজন সামান্য। যেমন আছি ঠিক তেমন আমাকে নিয়ে যাবো জলপাইগুড়ি। আমার শুকিয়ে যাওয়া চুল, ভেতরের কালি ঢেকে রাখার চেষ্টা করবো না আর। কেউ আমার অতিথি, আমি কারুর অতিথি।

আমাদের কোনো দেবতা নেই।

কাদা ছোড়াছুড়ির কোনো দিনক্ষণ হয় না। কিন্তু রঙ বিনিময়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত। পূর্ণিমা আসতে হবে, মুকুলের গন্ধ চাই, বাতাবীলেবুফুল ফুটি ফুটি ভাব, হাওয়ায় কী যেন নেই, কী যেন নেই, রঙিন ফুলেরাও নিঃশব্দে তীব্র আওয়াজ করবে। এই তো এই বসন্তেও...

শৈশবে সীমানা ছিলনা আমাদের, এখন সব বাড়িগুলো মাপাজোখা কাঁটা তার আর সিমেন্টের বেড়া দিয়ে, এক বাড়ির গেট দিয়ে গরু ঢুকে অন্যবাড়ির ফুলফলের গাছ খেয়ে আর এক বাড়ি দিয়ে বেড়িয়ে যেতো। আমাদের কাজ ছিল হুটহাট তাড়িয়ে দেওয়া। সীমানায় সুপারিগাছ আর পুঁইশাক গাছ। এই সময়, ঠিক এই সময় পুঁইশাক গাছের বীজ পাকতো। হাত দিয়ে ফাটালেও গাঢ় বেগুনি রঙ। কত রঙ। কত রকমের রঙ। সঙ্গে আমাদের আবিষ্কার করা ওই বেগুনি। সীমানা কি সত্যিই ছিল না? ছিলো। এখন বুঝতে পারি ছিল। সবার সঙ্গে মেশার অনুমতি ছিলো না। যা বলে দিতো, তাই শুনতে হতো। শুনতাম। যেটুকু শুনতাম না সেটুকু তখনও গোপন, এখনো।
আজ দোলপূর্ণিমা মা কি সেই দিনটা ভুলে গেছে? কে জানে? কাল বেশরাতে ঘুম ঘুম গলায় আমাকে ফোন করে বললো তুই কি ফোন করলি একটু আগে? আমি বললাম না তো। এত রাতে আমি কাউকেই ফোন করিনা। কিন্তু ভাবছিলাম। ব্যথা পেলে যেমন নিজের অজান্তেই মাগো বলে উঠি। মাকে মনে না করেই। বললাম ঘুমিয়ে পড়ো কাল সকালে কথা হবে। মন অন্য মনের সঙ্গে কথা বলে এভাবেই।

মানুষ অজস্র খুচরো পয়সার মত। এক একজনের পকেটে এক এক দল ঝনঝন করে।

চারপাশে বড় শব্দ। একই সঙ্গে ঠিক কতগুলো শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি.. ঘড়ির হৃদপিণ্ডের খ্যাসখ্যাস। চাররকম গাড়ি আর পাঁচকুকুরের আলাদা ভাষা রাতচরাদের মাথার ভেতরকার ঘন্টা কত কত শব্দ। এত শব্দের মধ্যেও দু-মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ার কৌশল জানে সমুদ্রে ভেসে চলা নাবিক।

ডুবে যাওয়া আর ভেসে ওঠার মধ্যে পার্থক্য ঠিক কতখানি জীবদেহ আর মৃতদেহ ভালো বলতে পারবে। যদি ওই ভাষা রপ্ত করা যেত। ওই ভাষার সাঁতার না জানারই কথা। সাঁতার এক ইউনিভার্সাল ভাষা। দেহ-সম্বন্ধীয়। মাছ, মাছরাঙা ও মানুষ একই সাঁতার ভিন্ন ভঙ্গিমায় সাঁতরে যেতে পারে। ভেসে ওঠা, ডুবে যাওয়া, সাঁতার এসব বললেই চোখের সামনে টলটল করে জল। ছলাৎছল। আগুনকে কখনো ডোবানো, ভাসানো শুনতে হয়না। আগুনসাঁতার কোনো কবিতাতেও কেউ কল্পনা করে না।

আমি আমাকে আমার পাশের চেয়ারে বসাই। চেয়ারটা না মুছেই বসতে দিয়েছি। খুঁতখুঁত করছে মন। এই আমি সাদা নরম পোশাক পরে থাকে সবসময়। কোনোদিন আয়নায় নিজেকে দেখেনি। চোখ কেবল একে ওকে তাকে দেখে। এমনকি সে জানেও না এমন একটা স্পষ্ট সপাট তানের মত আর এক আমি আছে তার। কুঁকড়ে থাকে। থুতনি সবসময় বুকের কাছে ঝুলে আছে। ইদানিং এই দুই আমিকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আলাদা করে দিয়ে মাঝেমাঝে পরীক্ষা নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কেউ কেউ থাকে বেশি তেল চড়া আঁচ। আবার কেউ কম তেল ঢিমে আঁচ। আমি ওই দ্বিতীয়টা। কারুর স্বাদ, কারুর স্বাস্থ্য। কারুর মশলাদার, কারুর নিভু নিভু...

কোনো কোনো দিন আমরা ভুলিনা। আবার কাউকে মনে করিয়েও দিতে চাই না। জল সেদিনও ফেলিনি আজো ফেলি না। বসন্তের নানা রকমফের হয়। শৈশবে প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সকালে প্রচুর শালিখ উড়িয়ে ঘুরেছিল আমার রুমালছাঁটের সাদা হলুদ ফ্রিল দেওয়া ফ্রক। তারপর থেকে ওই শব্দটার জন্য নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এখন বুঝি।

অনেক কিছুর কোন মানে হয়না, অনেক কিছু বুঝি না, কিছু কিছু বুঝতেও চাইনা। রজনীগন্ধা আমার দুচক্ষের বিষ। সে আমাকে যে যাই ভাবুক।সমবেদনা হল ভিখিরিকে ভিক্ষে দেওয়ার মত। কপর্দক শূন্য মানুষও কখনো সম্পদশালীর মত বাঁচতে জানে। শ্মশান একটি সুন্দর শব্দ। সেখানেও বসন্তে পলাশ আর শিমুল ফোটে। কারুর ঠোঁটের আকার এমনই যে সবসময় হাসির সাদা পায়রা ওড়ে...

সাদা জুতোটা একটা সাময়িক বাড়ির সিঁড়ির নীচে ফেলে রেখে চলে এসেছি। ছিঁড়ে গিয়েছিল তার শুকতলা। পুরনো ব্যবহারের আরামই আলাদা। অভ্যেসের দাসত্বের মত। দাসের যেমনতর লয়্যালটি থাকে আর কি। বেড়িটাও আর বন্ধকতা তৈরি করতে চায় না। যাইহোক ওই সাদাজুতোটা পরিত্যাগ করেছি। হয়তো সারানো যেত। সারালে একটু আঁটসাঁটও হয়ে উঠতো হয়তো বা। কিন্তু ত্যাগ করলে আর ছুঁতে নেই তাকে। সে এখন গভীর স্মৃতিতে সবে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বদলে আমার নতুন জুতো এসেছে। গাঢ় চেরিফলের মত তার রঙ। একটু লাজুক এখনো। দাগ লেগে যাবার ভয় এখনো আছে, নতুন যে। তাই ওইটুকুই সাবধানতা। সাদা জুতোর জন্য যতটা সাবধান ছিলাম এখন আর তেমন নেই। গাঢ় রঙ সামান্য ছোপছাপ শুষে নিতে পারে।

দাগকে বড় ভয় ছিল আমার। দাগ যেন একটা ব্যথার মত। মরে গেলেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দাগের চোখের পলক হয় না। পলকই সৌন্দর্য। নামা এবং ওঠা। পলক না থাকলে সৌন্দর্যের কোনো ব্যাপার থাকেনা। সত্যের মত কুঠারের ঘা, ঘা-এর পর ঘা। যেখানে পড়ার পড়তেই থাকে। ওই সাদা জুতোকে আমি দাগ থেকে বাঁচিয়ে রাখতাম। আর ওই বিশ্বস্ত আরামদায়ক জুতোটা আমার পা-কে। জুতোটাকে পরিত্যাগ করা মাত্র আমার পায়ের নীচে একটা কড়া পড়েছে। কড়াটা বাড়ছে। একটা না দেখা আঙটা তৈরি হচ্ছে।

গোড়ালিরা দাগ নিচ্ছে। চলতে চলতে দাগের ফাটল বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে ব্যর্থতার বীজ। ওদের চিহ্ন ছড়ানো থাকবে আমার যাওয়ার রাস্তায়। জরার রাস্তা খুলে যাচ্ছে আমার। লাজুক জুতো আপাতত লাজুক ভাব দেখালেও তত বিশ্বাসী নয় টের পাচ্ছি। চেরিফলের গন্ধে ম ম করছে ঋতু।

সাদাজুতোর সমীহ আমার চটের ঝোলা থেকে ইঁদুর লাফ লাফিয়ে রওনা দিয়েছে সাময়িক বাড়ি পেরিয়ে ফসলকাটা মাঠের দিকে। আমার ভাবনাচিন্তা বেশ কমে গেছে সাদাকে ত্যাগ করেছি বলে। চেরি গর্বে আমার মান অপমানবোধও কিছু কম। টুকটাক বাক্যের দাগ ছিটকে যাচ্ছে পানের পিকের মত। চেরি এসব পাত্তা দিচ্ছে না। দাগ না থাকলে ব্যথাও না থাকার কথা। ব্যথাকে আমার দারুণ ভয়। মস্তিষ্কের নতুন গুহায় আমি চেরি রঙ লাগাবো স্থির করেছি। থুথু আর পানের পিকএর দাগ ওখানে পৌঁছবে না। একটা নতুন ব্রাশ কিনতে হবে। অক্ষরের আর দরকার পড়বে না। রক্ত থেকে চেরি ফলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। ভোর হওয়ার বেশ আগেই আমার চোখে ওই রঙ এসে পৌঁছে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ আলো ফোটার আগে খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। একটা স্বল্পমেয়াদী ঘুমের পর পা-কে মন ভেবে যত্ন করা যাক মাঝে মাঝে।

সাদা ও চেরির মধ্যবর্তী কালো এক জুতো আমাকে মনমোহিনী রহস্য উপন্যাসের কথা বলে মাঝে মাঝেই। একটা কালো দীর্ঘ উপন্যাস লিখবো একদিন। টুকরো গদ্যে তার প্রস্তুতি চলছে তো চলছেই....

Copyright © 2019 Sabari Roy Published 1st Nov, 2019

শবরী রায় থাকেন পালা ক'রে কলকাতা, দিল্লী ও বম্বেতে। গদ্য ও কবিতা দুই লিখে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গীত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা দেখা যায়। প্রকাশিত বইগুলি - বৃষ্টির তাঁবুর ভেতর, শরীরের বাতিঘর, এসরাজে বেজেছে নীল সুর, শঙ্খ লেগেছে চাঁদে, হিজল গাছের বনসাই, জলরং, বুদ্ধ ও শূন্য, নূপুর খুলে রাখি।